

ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ

সାର୍ଥକ ଲାହା

ଆରକେଏମଭି

ORIGIN

ভক্তি আন্দোলন যা ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তির রহস্যময় মিলনের উপর জোর দিয়েছিল তা তুর্কিদের আগমনের অনেক আগে থেকেই ভারতে কাজ করছিল। বৈদিক যুগে ভারতীয় ধর্মে ভক্তি একটি ধারণা হিসেবে খুবই প্রাচীন। আসলে, ভগবত গীতা

এটাও উল্লেখ করে যে, একজনের উচিত সমস্ত ধর্মীয় পথ পরিত্যাগ করে একমাত্র ঈশ্বরে আশ্রয় নেওয়া, এবং এটি ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে জানার এবং যোগ অনুশীলন করার এবং ঈশ্বরে আশ্রয় নেওয়ার উপায়গুলি নিয়ে আলোচনা করো। ভক্তি শব্দটি মূল ভজ থেকে উদ্ভৃত, যার অর্থ 'আরাধনা করা'। ভক্তি শব্দটি সর্বপ্রথম উপনিষদে এসেছে। স্বেতাস্বতার উপনিষদে আমরা 'আত্মসমর্পণ' এবং 'অনুগ্রহ'-এর মতবাদ পাই।

এপিক্রো বারবার বলা হয়েছে যে মুক্তি পেতে হলে ভালো-মন্দ সহ সমস্ত বিপরীতকে অতিক্রম করতে হবে। জ্ঞান পথের লক্ষ্য এবং কর্মের পথ এইভাবে একই হয়ে যায়। যোগসূত্রগুলি একটি নতুন উপাদানও প্রবর্তন করে যা মুক্ত আত্মার চিরন্তন উদাহরণ হিসাবে ঈশ্বরের ধারণার উপর মনোনিবেশ করে।

একটি ধারণা হিসাবে ভক্তি প্রথম বৈষ্ণবদের স্তোত্রগুলির সাথে দক্ষিণ অঞ্চলে বিকশিত হয়েছিল আলওয়ার এবং শৈব নয়নাররা এবং ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য প্রতিরোধের বিরুদ্ধে একটি প্রধান আন্দোলন হয়ে ওঠে উত্তর অঞ্চলে চলে যাওয়া এবং পশ্চিম, পূর্ব এবং উত্তর পূর্ব অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে।

ভক্তি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

সর্বাঙ্গে ব্যক্তিগত ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি (ভক্তি) ধারণা। এটা যে কোন ভগবান হতে পারে বা যে কোন রূপে হতে পারে। কিছু ভক্ত ভগবানকে দেখেছেন শিক্ষক বা বন্ধু; একজন প্রেমিক; একজন স্বামী।

দ্বিতীয়টি হল, অর্থেডক্স বৈদিক ব্রাহ্মণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ব্রাহ্মণদের ঐশ্বরিক করুণা এবং পরিত্রাণের অ্যাক্ষেসে তাদের একচেটিয়াত।

তৃতীয়ত, জৈন ও বৌদ্ধদের অ-বিশ্বাসী, বিধর্মী এবং তাই ভিন্ন প্রকৃতির বলে তীব্র নিল্দা।

ভক্তি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

ভক্তি আন্দোলন মূলত একেশ্বরবাদী ছিল এবং ভক্তরা হয় একটি নির্দিষ্ট রূপ (সগুণ) বা নিরাকার (নির্গুণ) পূজা করত।

ভক্তির ব্যাখ্যাকারীরা একজন গুরুর গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন করেছেন।

অনেক ভক্ত নিম্ন বর্ণ থেকে আকৃষ্ট হয়েছিল, বিশেষ করে পরবর্তী সময়ে, যা জনপ্রিয় ধারণা দেয় যে এটি একটি সমতাবাদী আন্দোলন।

ভক্তি সাধকরা জনসাধারণের সহজ ভাষায় প্রচার করেছিলেন

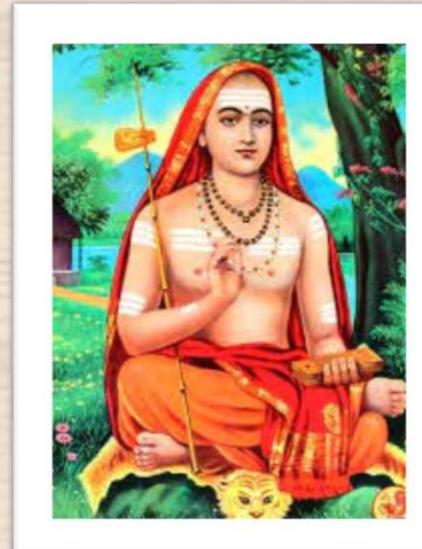
ভক্তি ছিল একটি ব্যাপক আন্দোলন এবং সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

এর একটি এজেন্ডা ছিল ইসলাম প্রচারের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য হিন্দু ধর্মের সংস্কার করা।

অন্য উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহ্যগত বর্ণ আবন্দন প্রথার সরলীকরণ।

সানাকার

বৌদ্ধিক স্তরে, বৌদ্ধ ধারণা এবং বিশ্বাসকে শঙ্করা ৪ম শতাব্দীর শেষের দিকে এবং ৭ম শতাব্দীর শুরুতে স্থাপিত করেছিলেন। শঙ্কর বেদান্ত ব্যবস্থাকে নিয়মতান্ত্রিক করেছিলেন এবং অদ্বৈত বা অদ্বৈতবাদের দর্শনের মহান প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর মতে, ঈশ্বর এবং অভূতপূর্ব জগতের বিচ্ছেদ অজ্ঞতার কারণে হয়েছিল এবং পরিত্রাণের পথ ছিল উপলক্ষ্মির মাধ্যমে, জ্ঞানের মাধ্যমে, যে ঈশ্বর এবং সৃষ্টি জগৎ এক।



তিনি কেরালার কালাডিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং 32 বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে তাঁর কৃতিত্বগুলি
আজও আশ্চর্য মনে হয়

দুই বছর বয়সে তিনি সাবলীলভাবে সংস্কৃত বলতে ও লিখতে পারতেন। চার বছর বয়সে তিনি সমস্ত বেদ পাঠ করতে পারতেন এবং
বারো বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন। এত অল্প বয়সেও তিনি শিষ্য সংগ্রহ করে সারাদেশে পদচারণা শুরু করেন।

আদি শক্তির নির্দেশনা এসেছে গৌড়পদ থেকে।

অদ্বৈত দর্শনের চ্যাম্পিয়ান হওয়া ছাড়াও, হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর অমূল্য অবদানগুলির মধ্যে একটি ছিল প্রাচীন সন্ন্যাস ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস
এবং পুনর্গঠন।

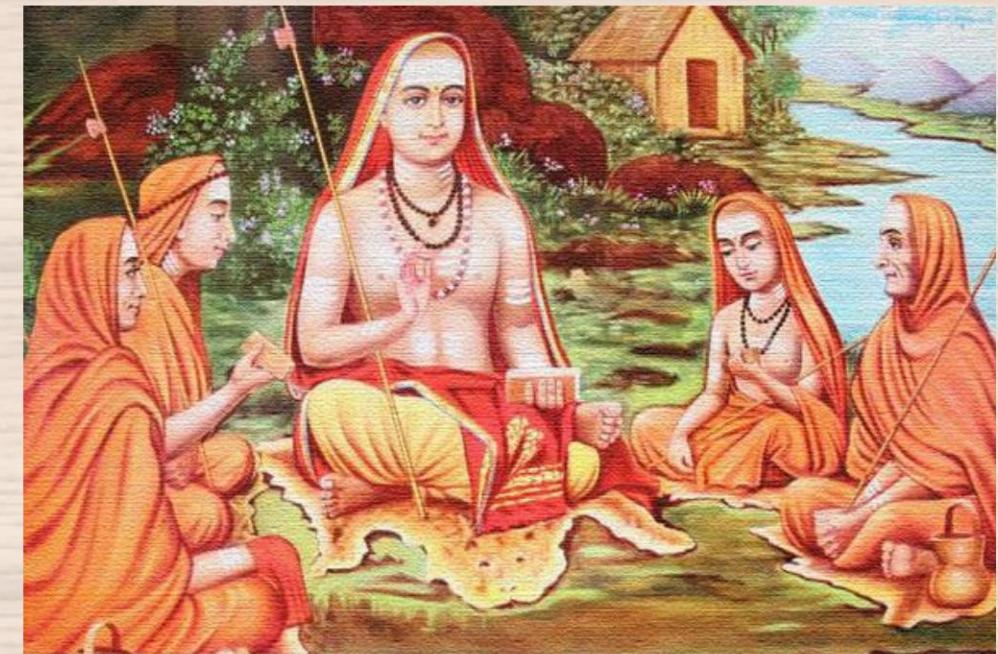
বদ্রীনাথে আদি শক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির। সেখানে নিজের লোক বসিয়েছেন। আজও, তিনি যে পরিবারগুলি স্থাপন করেছিলেন তার
বংশধররা - ঐতিহ্যগতভাবে, নাম্বুদিরিয়া - মন্দিরের পুরোহিত।

- ব্রহ্ম, শুন্দু চেতনা, পরম বাস্তবতা। পৃথিবীটা অবাস্তব। এই হল শাস্ত্রের সঠিক উপলক্ষ্মি হল বেদান্তের বজ্র ঘোষণা”

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ । କାହାରେ
କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ ॥

(ବ୍ରନ୍ଦଜ୍ଞାନୀବିଲା)

মোটকথা, ব্যক্তি ব্রহ্ম থেকে আলাদা নয়। এভাবে “ব্রহ্ম সত্যম জগন মিথ্যা, জীব
ব্রহ্মের না পর” এই উক্তিটির মাধ্যমে তিনি বিশাল শাস্ত্রের সারাংশকে
সংকুচিত করেছিলেন।



তিনি ভারতের চার কোণে 4টি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের মাধ্যমে অদ্বৈত শিক্ষা ও প্রচারের দায়িত্ব তাঁর চার শিষ্যকে দেন।

তিনি সৌন্দর্য লাহারী, শিবানন্দের মতো 72টি ভক্তিমূলক এবং ধ্যানমূলক স্তোত্র রচনা করেছিলেন লহরি, নির্বাণ শালকম, মানেষা পঞ্চকম। তিনি ব্রহ্ম সূত্র, ভগবদগীতা এবং 12টি প্রধান উপনিষদ সহ প্রধান শাস্ত্রীয় গ্রন্থের 18 টি ভাষ্যও লিখেছেন। তিনি অদ্বৈতের মৌলিক বিষয়ের উপর 23টি বইও রচনা করেছেন

বেদান্ত দর্শন যা অদ্বৈত ব্রহ্মের নীতিকে ব্যাখ্যা করে। এর মধ্যে রয়েছে বিবেকা চুদামণি, আত্মবোধ, বৈক্য বৃত্তি, উপদেশ সহশ্রী প্রমুখ।

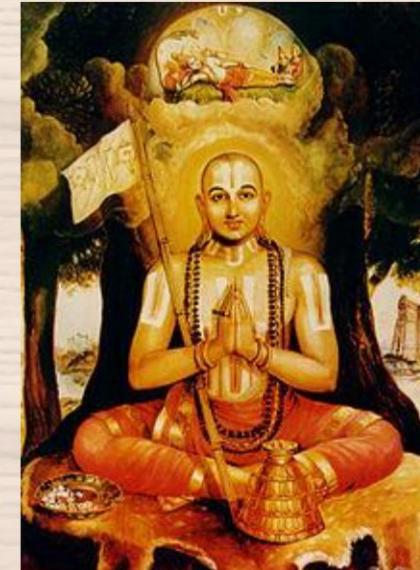
ভগবান শিবের অবতার হিসাবে বিবেচিত, শ্রী শঙ্কর মাত্র 32 বছর অল্প আয়ু বেঁচে ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে অনেক অনুপ্রেরণামূলক কিংবদন্তি রয়েছে।

অভিমুখ	দক্ষিণ ভারত	পশ্চিম ভারত	উত্তর ভারত	পূর্ব ভারত
স্থান	শূঙ্গেরি	দ্বারকা	বদ্রীনাথ	পুরী
গণিতের নাম	শূঙ্গেরী মঠ	সারদা মঠ	জ্যোতির মঠ	গোবর্ধন মঠ
আচার্য	সুরেশ্বরা	হস্তমালাকা	ত্রোতাকা	পদ্মপদ
বেদ	ইয়াগুর	সামা	অথব	রিক
মন্ত্র	অহম ব্রহ্মাস্মি	তত্ত্বমসি	আয়মাত্মা ব্রহ্ম	প্রজ্ঞানাম ব্রহ্ম
সন্ন্যাস আদেশ	সরস্বতী, ভারতী, পুরী	তীর্থ, আশ্রম	গিরি, পর্বত, সাগর বনম, অরণ্যম	

ରାମାନୁଜା

ଆରେକଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ସାଧକ ଛିଲେନ ରାମାନୁଜ ଯିନି ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀତେ ସ୍ଥାନ ପେଯେଛେ ।

ରାମାନୁଜ ଯୁକ୍ତି ଦିଯେଛିଲେନ ଯେ ପରିବାରେର ଜନ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରେର ଅନୁଗ୍ରହ ତାର ସମ୍ପର୍କେ ଜ୍ଞାନେର ଚେଯେ ବେଶି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତିନି ଆରାଓ ଯୁକ୍ତି ଦିଯେଛିଲେନ ଯେ ଭକ୍ତିର ପଥ ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷେ ସକଳେର ଜନ୍ୟ ଉନ୍ନୁତ୍ତ ଛିଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଶିଷ୍ୟ ନଥିଭୁତ୍ତ କରା ହେଯେଛି ।



ରାମାନୁଜ, ସାକେ
ରାମାନୁଜାଚାର୍ୟ ବା ଇଲାଇୟାଓ ବଲା ହୟ
ପେରମାଳ (ତାମିଲ: Ageless Perumal

[ସୀଶ୍ଵର]), (ଜନ୍ମ c. 1017, ଶ୍ରୀପେରାମବୁଦୁର, ଭାରତ—ମୃତ୍ୟୁ 1137, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ),
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମତ୍ତ୍ଵବିଦ୍ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ, ଭକ୍ତିମୂଳକ
ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ଏକକ ସବଚେଯେ ପ୍ରଭାବଶାଲୀ ଚିନ୍ତାବିଦ୍ ।



দীর্ঘ তীর্থযাত্রার পর, রামানুজ শ্রীরঞ্জমে বসতি স্থাপন করেন, যেখানে তিনি মন্দির পূজার আয়োজন করেন এবং দেবতা বিষ্ণু এবং তাঁর স্ত্রী শ্রী (লক্ষ্মী) এর প্রতি তাঁর ভক্তির মতবাদ প্রচারের জন্য কেন্দ্র স্থাপন করেন।

ঐতিহ্য আছে যে পরবর্তীতে তিনি চোলের রাজা কুলোত্তুঙ্গার উদ্যোগে ভুগেছিলেন
রাজবংশ, যারা দেবতা শিবকে মনে চলেছিল এবং পশ্চিমে মহীশূরে প্রত্যাহার করেছিল। সেখানে তিনি অনেক জৈন
ধর্মান্তরিত করেন, সেইসাথে হোয়শালা রাজবংশের রাজা বিত্তিদেবকেও; এটি 1099 সালে মিলুকোট (মেলকোট, বর্তমান
কর্ণাটক রাজ্য) শহরের প্রতিষ্ঠা এবং শেলভা পিল্লাই (বিষ্ণুর রূপ) এর কাছে একটি মন্দির উৎসর্গের দিকে পরিচালিত করে।

তাঁর তিনটি প্রধান ভাষ্য: বেদার্থ-সম্প্রস্থ (হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদের উপর), শ্রী-ভাষ্য (ব্রহ্ম-
সূত্রে), এবং ভগবদগীতা-ভাষ্য (ভগবদগীতার উপর)

রামানুজের মতবাদ

তাঁর মতবাদ শক্তির অযোগ্য অন্বেষণাত্মক ("যোগ্য অন্বেষণা") নামে পরিচিত।

রামানুজের তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে ব্রহ্ম এবং জগৎ উভয়ই দুটি ভিন্ন পরম, উভয়ই আধিভৌতিকভাবে বাস্তব, উভয়কেই মিথ্যা বা অলীক বলা উচিত নয় এবং গুণাবলী সহ সগুণ ব্রহ্মও বাস্তব। ঈশ্বর, মানুষের মত, রামানুজ বলেন, আস্যা এবং দেহ উভয়ই রয়েছে এবং সমস্ত জগতই ঈশ্বরের দেহের মহিমা। ব্রাহ্মণের (বিষ্ণুর) পথ, রামানুজ দৃঢ়তার সাথে, ধার্মিকতার প্রতি ভক্তি এবং ব্যক্তিগত ঈশ্বরের (সগুণ ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু) সৌন্দর্য এবং প্রেমের অবিরাম স্মরণ।

মাধবাচার্য



মাধবাচার্য নারায়ণ ভট্ট এবং বেদবতীর কাছে উদুপির কাছে একটি ছোট জায়গা পাজাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 1238 সালে বিজয়াদশমীর শুভ দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর নাম রাখা হয়েছিল বাসুদেব।

তিনি শ্রী শঙ্করাচার্য এবং শ্রী রামানুজাচার্যের পরে এসেছিলেন। তিনি দ্বৈত বা দ্বৈতবাদের দর্শন তুলে ধরেন।

তিনি অচুর্যতপ্রেক্ষার দ্বারা সন্ধাসে দীক্ষিত
হয়েছিলেন, যিনি অদ্বৈত স্কুল অফ ফিলোসফির একজন মহান
শিক্ষক ছিলেন। দীক্ষার সময় তাকে পূর্ণপ্রজ্ঞা নাম দেওয়া
হয়েছিল। এটাও ছিল অচুর্যতপ্রেক্ষা

যিনি তাকে 'মাধব' উপাধি দিয়েছিলেন যার দ্বারা তিনি বেশি
পরিচিত ছিলেন।

মাধবাচার্য ভগবদগীতা এবং ব্রহ্ম সূত্র সহ বেশ কয়েকটি
গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু পবিত্র গ্রন্থের ভাষ্য লিখেছেন।

দ্বৈত দর্শন

দ্বৈত জোর দেন যে জগৎ বাস্তব এবং শুধু একটি মায়া নয়।

শ্রী মাধবাচার্যের কিছু শিক্ষা এই লাইনে পড়ে:

আত্মা অজ্ঞানতা দ্বারা এই জগতে আবদ্ধ হয়

এই বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তির উপায় হল শ্রীহরির কৃপালাভ করা

শ্রী হরির কাছে যেতে হলে ভক্তি সাধনা করতে হবে, এ ছাড়া উপায় নেই

ভক্তি অনুশীলন করতে হলে ধ্যান করতে হবে

ধ্যান করার জন্য, একজনকে মন পরিষ্কার করতে হবে এবং পবিত্র গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে
বিচ্ছিন্নতা অর্জন করতে হবে

গুরুর কৃপাতেই পবিত্র গ্রন্থগুলি বোঝা সম্ভব।

যদিও দক্ষিণ এবং উত্তর ভারতের মধ্যে যোগাযোগের অনেকগুলি বিল্ড ছিল, তবে ভঙ্গি সাধকদের ধারণাগুলি দক্ষিণ থেকে উত্তর ভারতে প্রেরণ একটি ধীর এবং দীর্ঘ টানা প্রক্রিয়া ছিল।

14-15 শতক থেকে উত্তর ভারতে শুরু হওয়া জনপ্রিয় ভঙ্গি আন্দোলনকে প্রায়শই দক্ষিণ আন্দোলনের একটি অফ-শুট হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ভঙ্গির ধারণাগুলি পণ্ডিত এবং সাধুদের দ্বারা উত্তরে বহন করা হয়েছিল। এর মধ্যে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিকশিত হওয়া মহারাষ্ট্রীয় সাধক নামদেব এবং চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্থাপিত রামানন্দের উল্লেখ করা যেতে পারে। নামদেব ছিলেন একজন দর্জি। কথিত আছে যে তিনি সাধু হওয়ার আগে দস্যুতা করেছিলেন। মারাঠি ভাষায় রচিত তাঁর কবিতা সৈম্বরের প্রতি তীব্র প্রেম ও ভঙ্গির আত্মাকে শ্঵াস দেয়। কথিত আছে, নামদেব বহুদূর ভ্রমণ করেছেন এবং সুফি সাধকদের সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত হয়েছেন। আরেক সাধক, রামনাদ, যিনি রামানুজের অনুসারী ছিলেন, তিনি প্রয়াগে (এলাহাবাদ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে এবং বেনারসে বসবাস করতেন। তিনি বিষ্ণুর অবতার হিসেবে রামের উপাসনাকে জনপ্রিয় করেছিলেন। আরও কী, তিনি চারটি বর্ণকে তাঁর ভঙ্গির মতবাদ শিখিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন বর্ণের লোকদের একসাথে রান্না করা বা খাওয়ার নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করেছিলেন। তিনি নিষ্প বর্ণ সহ সকল বর্ণের শিষ্য তালিকাভুক্ত করেছেন বলে জানা যায়। এইভাবে, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রবিদাস ছিলেন, যিনি বর্ণ অনুসারে একজন মুচি ছিলেন; কবির, যিনি ছিলেন তাঁতি; সেনা, যিনি নাপিত ছিলেন; এবং সাধনা, যিনি একজন কসাই ছিলেন। নামদেব তাঁর শিষ্যদের তালিকাভুক্ত করার ক্ষেত্রে সমানভাবে বিস্তৃত ছিলেন।

ভক্তি এবং আলভারস

ভক্তি আন্দোলন, মধ্যযুগের সময়কাল, যেখানে একটি নতুন ধরনের সংস্কৃতি এবং ভক্তি পথ প্রবর্তিত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে, পূর্ববর্তী ধর্মীয় রীতিগুলি সম্পূর্ণরূপে কল্পিত এবং জটিল ছিল। সমাজ জাতপাতের প্রবণতা থেকে ফ্লান্ট হয়ে পড়েছিল, এবং সেই সময়ে, ভক্তির একটি নতুন পথের প্রয়োজন ছিল। এমন কিছু যা সমাজকে সংস্কার করতে এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করতে পারে। ভক্তি আন্দোলন সমাজ সংস্কারে এবং জাতিভেদ প্রথার শৃঙ্খল ভাঙতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। জাতপাতের ভিত্তিতে মানুষের প্রতি বৈষম্য না করে ভক্তির পথ দেখিয়েছে। এখানে আমরা দক্ষিণ অঞ্চলে বিশেষ করে আলভার ও নয়নারদের নতুন ধরনের ভক্তি নিয়ে আলোচনা করব।

আলভার এবং নয়নাররা বর্ণপ্রথা এবং সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেছিল। মধ্যযুগে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ছিল এবং মানুষ জাতিভেদ প্রথা দ্বারা খুব প্রভাবিত ছিল। আলভার ও নয়নাররা ছিলেন শিব ও বিষ্ণুর ভক্ত। তারা তাদের বর্ণ বা সামাজিক পটভূমির প্রতি বৈষম্য ছাড়াই ঈশ্বরের ভক্তির পথে পরিচালিত করেছিল।

আলভারস

আলভাররা হলেন দক্ষিণ ভারতের বারোজন বৈষ্ণব সাধক যারা সাধারণ যুগের ষষ্ঠ এবং নবম শতাব্দীর মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিলেন। তামিল শব্দ আলভার ইঙ্গিত করে যে তারা ঈশ্বর-মাতাল লোক ছিল। তারা ছিল বিচরণকারী সাধু যারা ভগবান বিষ্ণুর প্রশংসা করত। আলভাররা কোন জাতিগত অনমনীয়তা বজায় রাখেনি এবং তারা বিভিন্ন বর্ণ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের মধ্যে সাতজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্ৰিয়, দুইজন শূদ্র এবং একজন নিম্ন পানার বর্ণের। তাদের মধ্যে অন্ডাল নামে একজন মহিলা ছিলেন। আলভাররা ভক্তির বিভিন্ন প্রকারের অনুশীলন করত কিন্তু সবচেয়ে সাধারণটিকে বলা হয় প্রপট্টি (আত্ম-সমর্পণ), যা ভক্তির সাধারণ প্যাটার্ন থেকে আলাদা (প্রকৃতিতে আরও প্রযুক্তিগত এবং তিনটি উচ্চ বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ)। আলভাররা বিষ্ণুর ভক্ত হওয়ায় দেবতাকে উৎসর্গ করা অনেক মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে।

তাদের পরিদর্শনকালে তারা বিষ্ণুর প্রশংসায় ভক্তিমূলক স্নোত্র রচনা করেন। এই স্নোত্রগুলি বিষ্ণুর মহিমাকে মহিমাওত্তমিত করে ভক্তি ও আত্মসমর্পণকে উন্নীত করেছিল। যদিও তাদের স্তবকগুলি বেদের ধারণায় পরিপূর্ণ, তবুও তাদের স্বতন্ত্রতা নিহিত রয়েছে ভক্তি ও আত্মসমর্পণের উপর প্রবল জোর, যা বেদ মন্ত্রে বা উপনিষদের মধ্যে অত্যন্ত আধিভৌতিক উচ্চারণে খুব কমই পাওয়া যায়।

পোকাইয়াভার

ভুথাথালওয়ার

বেয়ালওয়ার

থিরুমবিসিয়ালওয়ার

নম্মালভার

মধুরকবি আলভার

কুলাশেখারা আলওয়ার

পেরিয়ালওয়ার

অন্ডাল

থনদরটি পডিয়ালভার

তিরুপ্পানাওয়ার

থিরুমংয়াথওয়ার



Periyalvar



Andal



Kalasikarni Alvar



Thirumalai Alvar



Thandadeepali Alvar



Tiruppaan Alvar



Tirumangai Alvar



Poogi Alvar



Bhoothathalvar



Peyalvar



Namalvar



Mehandikavi Alvar

নয়নরস

৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শতাব্দীর মধ্যে, দক্ষিণ ভারতে ভগবান শিবের ৬৩ জন উত্সাহী ভক্তের বাসস্থান ছিল যারা নয়নার (বা নয়নার) নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। এই ধার্মিক আত্মার মধ্যে বেশ কয়েকজন, সমাজের সমস্ত অংশ থেকে এসেছেন- কুমোর, জেলে, কৃষক, বণিক, পুরোহিত, শিকারী, ধোপা-রচিত ভক্তিমূলক স্তোত্র যা আজও বিশ্বব্যাপী ভক্তদের দ্বারা গাওয়া হয়। ৬৩টি নয়নমার, অরূপথুকে উৎসর্গ করা একটি উৎসব

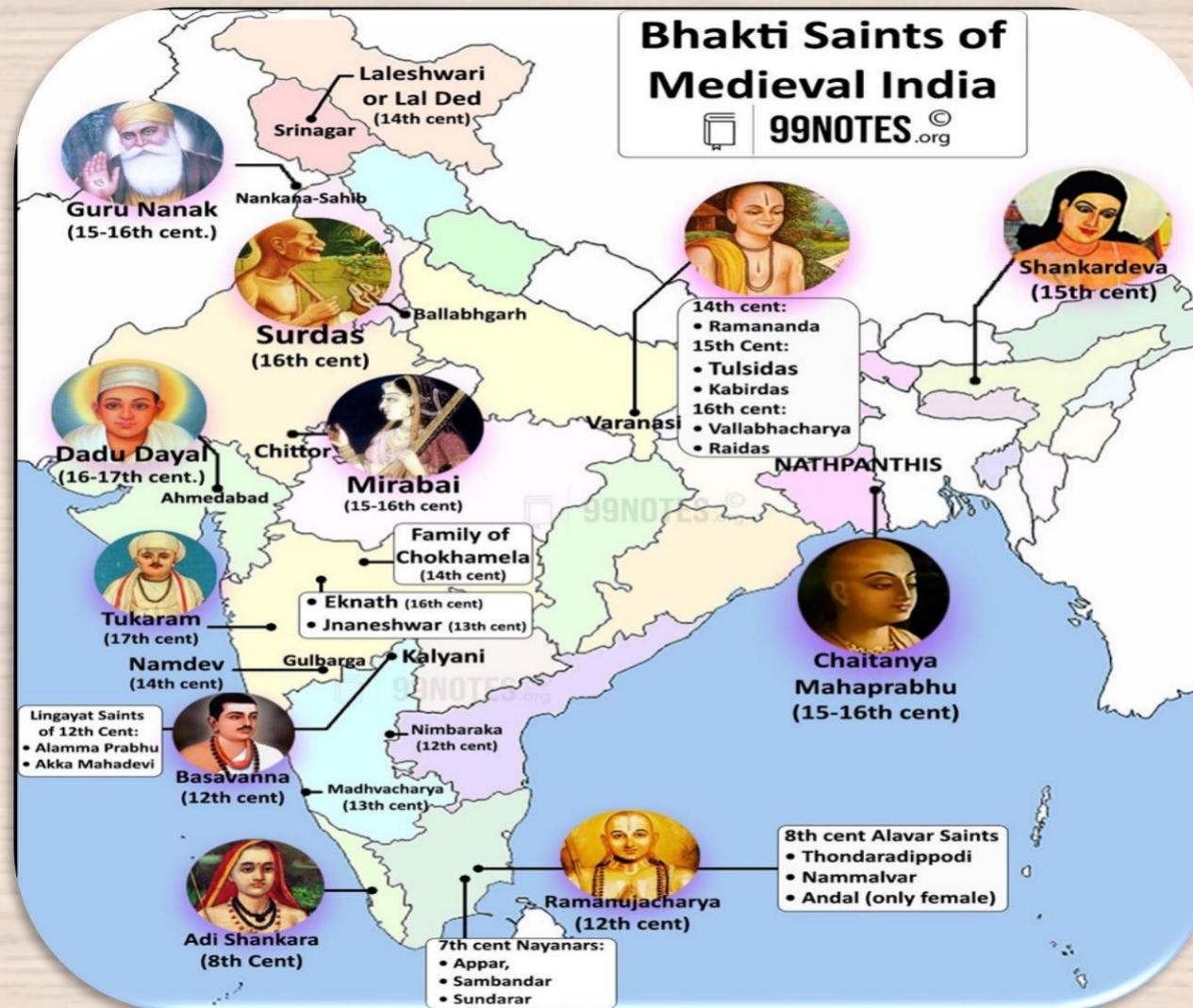
মুভার থিরুভিলা, তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের কপালেশ্বর মন্দিরে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়।

তিনজন বিশিষ্ট নয়নার - আশ্নার, সম্বল্দর এবং সুন্দরার

(থেভারাম স্তোত্রের রচয়িতা) — মানিককাভাসাগরের সাথে সমায়াচার্য (বিশ্বাসের শিক্ষক) বলা হয় যাকে তামিল ভাষায় বলা হয় নলভার, "দ্য ফোর।" তারা জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশকে প্রতিরোধ করে শৈব সিদ্ধান্ত দর্শন ও সংস্কৃতির প্রচার করেছিল। তারা শিখিয়েছিল যে শিব হল প্রেম এবং সেই ভালবাসা (সকল প্রাণীর জন্য-

প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত অস্তিত্বের জন্য) শিব, পরম সত্ত্বার কাছে পৌঁছানোর চাবিকাঠি।

নামদেব (1270-1350) দর্জি জাতিভুক্ত ছিলেন। তাকে মহারাষ্ট্রীয় ভক্তি আন্দোলন এবং উত্তর ভারতীয় একেশ্বরবাদী আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র বলে মনে করা হয়। তিনি পন্থারপুরে থাকতেন কিন্তু পাঞ্জাব সহ উত্তর ভারতে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভক্তি গানগুলি ও আদি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মহারাষ্ট্রে, নামদেবকে বারকরী ঐতিহ্যের (বৈষ্ণব ভক্তিমূলক ঐতিহ্য) একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু উত্তর ভারতীয় একেশ্বরবাদী ঐতিহ্যে তাকে নির্ণৰ্ণ সাধক হিসাবে স্মরণ করা হয়। মহারাষ্ট্রের অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্তি সাধক ছিলেন একনাথ (1533-99) এবং তুকারাম (1598-



কবির

যারা বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার সবচেয়ে বেশি সমালোচক ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য জোরালো আবেদন করেছিলেন, তাদের মধ্যে কবির এবং নানকের নাম উল্লেখযোগ্য।

কবির ছিলেন ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মরমী সাধক। কবীরের তারিখ এবং প্রথম জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা রয়েছে। জনশ্রুতি আছে যে তিনি একজন ব্রাহ্মণ বিধবার পুত্র ছিলেন যিনি তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং তিনি একজন মুসলিম তাঁতীর ঘরে প্রতিপালিত হয়েছিলেন।

তিনি তার দত্তক পিতার পেশা শিখেছিলেন, কিন্তু কাশীতে থাকার সময় তিনি হিন্দু সাধক এবং সুফি উভয়ের সংস্পর্শে আসেন।

তিনি নাথপন্থীদের দ্বারাও প্রবলভাবে প্রভাবিত ছিলেন। কবির সৈশ্বরের একদ্বয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন যাকে তিনি বিভিন্ন নামে ডাকেন, যেমন রাম, হরি, গোবিল, আল্লাহ, সাইন, সাহেব ইত্যাদি।

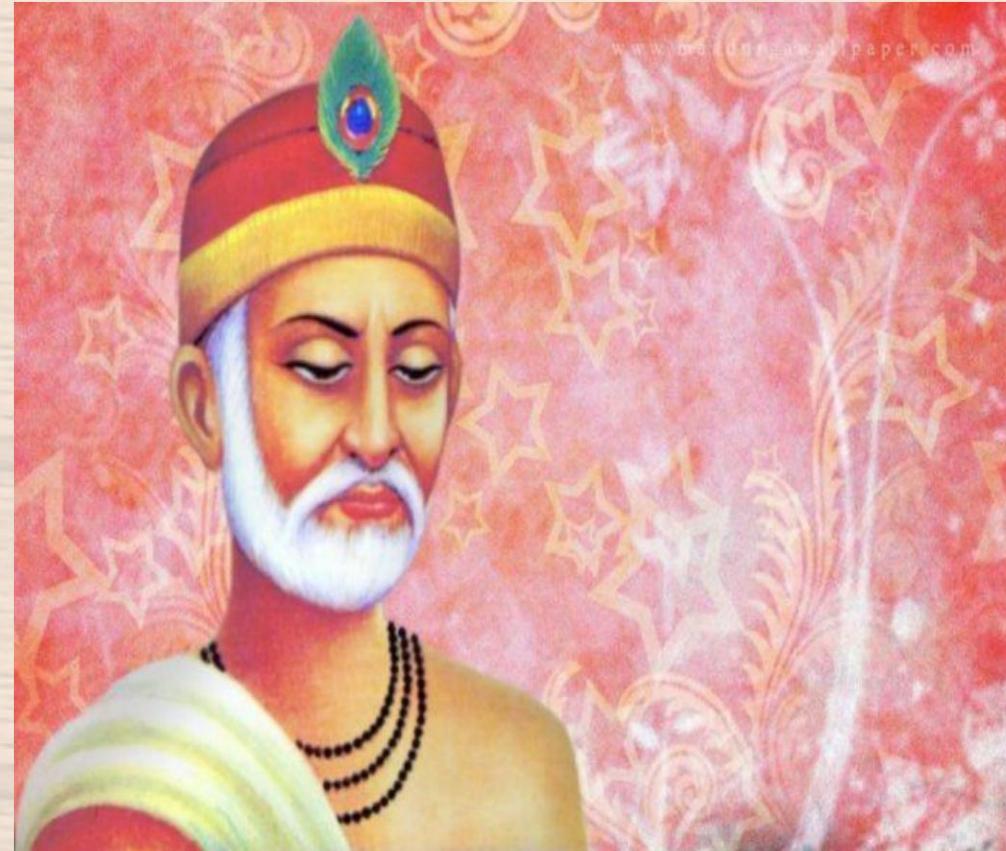
তিনি মূর্তি-পূজা, তীর্থযাত্রা, পবিত্র নদীতে স্নান বা নামাজের মতো আনুষ্ঠানিক উপাসনায় অংশ নেওয়ার তীব্র নিল্দা করেছেন।

সাধক জীবনের জন্য সাধারণ গৃহস্থের জীবন ত্যাগ করাও তিনি প্রয়োজন মনে করেননি।

কবির

'বিজক' নামক একটি গ্রন্থে ব্রহ্মা, আত্মন, কর্ম, পুনর্জনন প্রভৃতি
ধারণার বর্ণনা রয়েছে। কবির অনেক দোহা, সবদ, সখী রচনা
করেছেন।

একজন আধুনিক ইতিহাসবিদ ডঃ তারা চাঁদ বলেছেন: "কবীরের
লক্ষ্য ছিল এমন একটি প্রেমের ধর্ম প্রচার করা যা সকল
জাতি ও ধর্মকে একত্রিত করবে। তিনি হিন্দুধর্ম ও ইসলামের সেই
বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যা এই চেতনার বিরোধী
এবং যা ব্যক্তির আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য কোন গুরুত্ব বহন করে
না।



নানক



কবিরের মতো, নানক এক সৈশ্বরের উপর জোর দিয়েছিলেন, যার নাম পুনরাবৃত্তি করে এবং প্রেম ও ভক্তি সহকারে বাস করলে জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ ছাড়াই মুক্তি পাওয়া যায়।

গুরু নানক, যার শিক্ষা থেকে শিখ ধর্মের উন্নত হয়েছিল, ১৪৬৯ সালে রাতি নদীর তীরে তালওয়ান্দি গ্রামে (বর্তমানে নানকানা বলা হয়) এক খট্টী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

যদিও তাড়াতাড়ি বিয়ে করেছিলেন, এবং তার পিতার অ্যাকাউন্ট্যান্সির পেশা গ্রহণ করার জন্য ফার্সি ভাষায় প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, নানক একটি রহস্যবাদী, মননশীল মনোভাব দেখিয়েছিলেন এবং সাধু ও সাধুদের সঙ্গ পছল্দ করেছিলেন।

কখনও কখনও পরে, তিনি একটি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ছিল এবং পৃথিবী ত্যাগ করেছিলেন।

তিনি স্ন্তোত্র রচনা করেছিলেন এবং রবাবের সঙ্গতে সেগুলি গাইতেন, এটি তার বিশ্বস্ত পরিচারক, মারদানা দ্বারা বাজানো একটি তারযুক্ত ঘন্টা।

কথিত আছে যে নানক সমগ্র ভারতে এবং এমনকি এর বাইরেও দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা এবং পশ্চিমে মঙ্গা ও মদিনা পর্যন্ত বিস্তৃত সফর করেছিলেন।

তিনি বিপুল সংখ্যক লোককে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেছিলেন এবং 1538 সালে তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁর নাম ও খ্যাতি বহুদূরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কবির ও নানকের নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন ছাড়াও উত্তর ভারতে ভক্তি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল বিষ্ণুর দুই অবতার রাম ও কৃষ্ণের পূজাকে ধিরে। কৃষ্ণের শৈশব পলায়ন এবং গোকুলের দুঞ্চিদাসীর সাথে তার ঘনিষ্ঠতা, বিশেষ করে রাধার সাথে, সাধু-কবিদের একটি উল্লেখযোগ্য সিরিজের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে যারা তাদের আত্মার বিভিন্ন দিক থেকে সম্পর্ককে চিত্রিত করার জন্য রূপকভাবে ব্যবহার করেছেন। পরম আত্মার সাথে। বেদান্তিক যুক্তিবাদের কেন্দ্র ছিল নদীয়ায় জন্মগ্রহণ ও শিক্ষিত, চৈতন্যের জীবনকাল পরিবর্তিত হয় যখন তিনি 22 বছর বয়সে গয়া সফর করেন এবং এক নির্জন ব্যক্তির দ্বারা কৃষ্ণ সাধনায় দীক্ষিত হন। তিনি একজন নেশাগ্রস্ত ভক্ত হয়ে ওঠেন যিনি অবিরাম কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করতেন। আদি সুফিদের মতো চৈতন্য

গানের সমাবেশ বা কীর্তনকে রহস্যময় অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ রূপ হিসাবে জনপ্রিয় করে তুলেছিল যেখানে ঈশ্বরের নাম নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় বাইরের জগত। তিনি রাধা-কৃষ্ণের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম অর্জনের অনুশীলন হিসাবে যুগ-ধর্ম ছড়িয়ে দেন। সেই প্রক্রিয়াটি হল হরিনাম-সংকীর্তন, বা কৃষ্ণের পবিত্র নামগুলির সমবেত জপ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে”।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ

চৈতন্য

চৈতন্য (1486-1533) ছিলেন বাংলার সবচেয়ে বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধক। তিনি পূর্ব ভারতের অনেক জায়গায় কৃষ্ণভক্তিকে জনপ্রিয় করেছিলেন। একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে তার জনপ্রিয়তা এত বেশি ছিল যে তাকে কৃষ্ণের অবতার (অবতার) হিসেবে দেখা হতো। চৈতন্যের আবির্ভাব বঙ্গীয় বৈষ্ণব ভক্তির কেন্দ্রবিন্দুকে ভক্তিমূলক সাহিত্য রচনা থেকে একটি বিস্তৃত সামাজিক ভিত্তি সহ পূর্ণাঙ্গ সংস্কার আন্দোলনে স্থানান্তরিত করে।

চৈতন্য কৃষ্ণ-ভক্তিকে একটি জনপ্রিয় ভিত্তি দেওয়ার জন্য বর্ণ, ধর্ম এবং লিঙ্গের সমস্ত পার্থক্যকে উপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর অনুসারীরা সকল জাতি ও সম্পদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য ছিলেন হরিদাস যিনি একজন মুসলিম ছিলেন। তিনি উচ্চসিত ন্ত্যের সাথে সংকীর্তন বা দলীয় ভক্তিমূলক গানের অনুশীলনকে জনপ্রিয় করেছিলেন।

চৈতন্যের আন্দোলন বাঙালি সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। ভক্তিমূলক গানের ক্ষেত্রে জাতিভেদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা বাঙালি জীবনে সমতার বোধকে উন্নীত করেছিল। বাংলায় এবং পুরীতে, ওড়িশায় তার আন্দোলন জনপ্রিয় ছিল।

এই জায়গাগুলিতে, তাঁর অনুসারীরা সর্বদা পঞ্চিত ব্রাহ্মণ ছিলেন না তবে সাধারণ মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তারা বাংলায় লিখেছেন, তাঁর ভক্তি প্রচার করেছেন এবং চৈতন্যকে জীবন্ত কৃষ্ণ বা রাধা ও কৃষ্ণ এক দেহে দেখেছেন।



ভক্তি ও নারী

ঈশ্বরের সাথে একজন মহিলার সম্পর্ক যে কোনও সমাজে লিঙ্গ সম্পর্ক বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক। ভক্তিতে তাদের সংগ্রাম পরিবার এবং পারিবারিক মূল্যবোধের সাথে এবং প্রায়শই বিবাহের বিরুদ্ধে। ভক্তি ঐতিহ্যে ঈশ্বরের ধারণাবাদ হল সমান অংশীদার এবং আত্মবিশ্বাসের। ভক্তিতে পুরুষরা প্রায়ই মেয়েলি কঢ়ে কথা বলে।

মহিলা ভক্তদের মধ্যে মীরাবাই, আঙ্কা মহাদেবী, লাল দেড, সহজো বাই, দিবালিবাই এবং গৌরাবাই, গঙ্গা সতী, সন্ত তোরাল, জনাবাই এবং বাহিনা বাই বিখ্যাত ছিলেন।

নারী ভক্তরা পিতৃতন্ত্রের সাথে আলোচনা করে নিজেদের জন্য একটি বিকল্প স্থান তৈরি করেছিল যা আজও লোকস্মৃতিতে টিকে আছে।

মীরাবাই

মারোয়ারের কুর্কিতে রাজপুত রাজা ঠাকুর রতন সিং এবং বীর কুমারীর ঘরে মীরাবাই জন্মগ্রহণ করেন।
রাজস্থানের জেলা।

প্রত্যেক রাজকন্যা হিসেবে তিনি শাস্ত্র, সঙ্গীত, শিল্প, দর্শন, ঘোড়ায় চড়া, তলোয়ার যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষিত ছিলেন।

আগের বয়স থেকেই মীরা নিজেকে কৃষ্ণ ভক্তিতে নিমজ্জিত করেছিল।

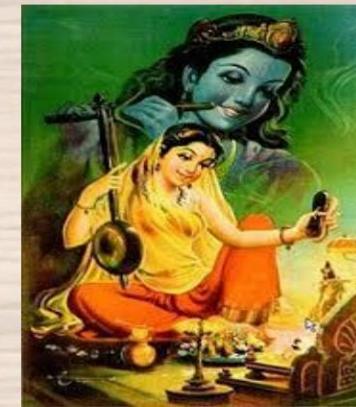
কিন্তু ঐতিহ্য অনুসারে 13 বছর বয়সে চিতোর ভোজরাজের রাজকুমারের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। তিনি প্রচলিত বিবাহিত জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হননি। কারণ মনে মনে তিনি আগেই শ্রীকৃষ্ণের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

কিন্তু রাজপরিবারের সদস্য ঈর্ষাণ্বিত হয়ে তাকে অনেক সময় নানাভাবে হয়রানি করতেন।

এই কারণে মীরা চিতোর ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে যান তার প্রভুর কাছে। তিনি একটি ছোট গোবিল্ড মন্দিরের পূজায় নিজেকে নিমগ্ন করতে থাকেন।

মীরা বৃন্দাবনে তার কীর্তন, ভজন চালিয়ে যান। মীরাবাই অনেক ভজন রচনা করেছিলেন
(মীরার ভজন) যা আজ পর্যন্ত গাওয়া হয়।

তিনি জীবন্ত প্রমাণ ছিলেন যে কেউ পার্থির ধন-সম্পদ ও পদের উর্ধ্বে উঠে কৃষ্ণ-প্রেমে ভরা কঠোর জীবনযাপন করতে পারে। তিনি সকল সামাজিক
রীতিনীতির বিরুদ্ধে ছিলেন।



প্রভাব

ভঙ্গি কাল্টের মূল নীতিটি ছিল একজন ব্যক্তিগত সীমারের প্রতি ভঙ্গিকে প্রভাবিত করে, যার কৃপাই ছিল মুক্তি বা মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়।

ভঙ্গিবাদীরা শিশুহত্যা এবং সতীদাহের মতো বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে তাদের শক্তিশালী আওয়াজ তুলেছিল এবং মদ, তামাক এবং তাড়ি নিষিদ্ধ করার জন্য উত্সাহিত করেছিল। ব্যতিচার এবং ব্যতিচারকেও নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল।

তারা উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে একটি ভালো সামাজিক ব্যবস্থা স্থাপনের লক্ষ্য নিয়েছিল।

সহনশীলতা, সম্প্রীতি এবং পারম্পরিক শৰ্দ্দার চেতনা যা ভঙ্গি সাধকদের দ্বারা উদ্বোধন করা হয়েছিল তার আরেকটি চিরন্তন প্রভাব ছিল - সত্যপীরের একটি নতুন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। এটি জৌনপুরের রাজা হোসেন শাহের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল যা পরে আকবর কর্তৃক গৃহীত মুক্তির চেতনার পথ প্রশস্ত করে।

ভঙ্গি আন্দোলন দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটায়।

হিন্দিতে কবির, গুরুমুখীতে নানক এবং বাংলায় চৈতন্য।

পূর্বে উল্লিখিত সমস্ত সাধক-কবি হিন্দুধর্মের বিস্তৃত কাঠামোর মধ্যেই ছিলেন। তারা সকলেই ঈশ্বর এবং সৃষ্টি জগতের ঐক্যের উপর জোর দিয়েছে।

ভক্তি প্রচারক জাতপাতের বাঁধ ভেঙে হিন্দি সমাজের নতুন শক্তি ও প্রাণ দিয়েছেন।

এই সাধক-কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ব্যাপকভাবে মানবতাবাদী।

ভক্তি আন্দোলন ছিল ব্রাহ্মণবাদী গৌড়ামির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ।

এটি হিন্দুধর্মের মহান এবং মৌলিক সংস্কারের দিকে পরিচালিত করেছিল।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্য গড়ে তোলা।

ভক্তি আন্দোলনের সাধক এবং সুফি সাধকগণ সকলের মধ্যে বন্ধুত্ব, বন্ধুত্ব, সহনশীলতা, শান্তি ও সাম্যের বার্তা ছড়িয়ে দেন।

আন্দোলনের সময় ঈশ্বরের উপাসনা ও বিশ্বাসের পদ্ধতি নতুন মোড় নেয়।

অতঃপর, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, যিনি হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই ঈশ্বরের ঈশ্বর।

তাই, ভক্তি আন্দোলন হিন্দু সমাজে কার্যত এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল।

তথ্যসূত্র

তিনষ্টি নয়নার সাধু- স্বামী শিবানন্দ

আল্দেয়া নিপার্ড- দ্য আলভারস।

কে আলেয়াজ- বৈষ্ণব আলভারের ভক্তি ঐতিহ্য এবং ধর্মতত্ত্ব।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস- সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

চারি এসএমএস- দর্শন এবং আলভার্সের আস্তিক রহস্যবাদ।

মধ্যযুগীয় ভারত (সুলতানাত থেকে মুঘল পর্যন্ত 1206-1526), প্রথম অংশ- সতীশ চন্দ্র

মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস- সতীশ চন্দ্র

মধ্যযুগীয় ভারতের একটি ব্যাপক ইতিহাস- সালমা আহমেদ ফারুকী

মধ্যযুগীয় ভারতে ভক্তি আল্দোলন- শাহাবুদ্দিন ইরাকী

ভক্তি আল্দোলন-একটি ব্যাখ্যা-রেখা পান্ডে

ভক্তি আল্দোলনে মীরাবাই এবং তার অবদান- এস এম পান্ডে, নরম্যান জিড

বিদ্রোহীরা — কনফর্মিস্ট? মধ্যযুগীয় দক্ষিণ ভারতে নারী সাধু- বিজয়া রামস্বামী